

মাআল আহিমাহ

(ইলমি জগতে চার ইমামের জীবন, কর্ম, চিন্তা,
মতভেদ ও মতানৈক্যের সরল উপস্থাপনা)

মূল : ড. সালমান আল আওদাহ

ভাষান্তর : সাইফুল ইসলাম তাওহিদ



গার্ডিয়ান

পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

উম্মাহর পথিকৃৎ ইমামগণ	
যুগ সন্ধিক্ষণ	১৩
ইজমার যুগ	১৪
মূল ও শাখা-প্রশাখা	১৪
পরিবেশ-পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যতা	১৭
ইমামত ও যোগ্যতা	১৯
বিপদাপদ ও পরীক্ষা	২৩
ঐতিহাসিক বিন্যাস	২৬
ইমামদের প্রধান কিছু বৈশিষ্ট্য	২৮
শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান	৩৩
তারসাম্যের কেন্দ্রবিন্দু	৩৬
হক কি চার মাজহাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ	৩৮
চার মূলনীতি	৪১
ইমামগণ নিষ্পাপ নন	৪৩
বাড়াবাড়ি ও কঠোরতার মাঝে ইমামগণ	৪৬
ইমামদের ইলম ও চারিত্রিক অবস্থান	৪৯
হকের দিকে ফিরে আসা একটি মহৎ গুণ	৫১
ব্যক্তি ও জনগণের অধিকার	৫৩
স্বভাব-চরিত্রের বৈচিত্র্য	৫৬
ইমামদের বিচ্ছিন্ন মতামত	৬৩
স্বভাব	৬৭
আমলের জন্য ইলম	৬৯
বংশের ভিন্নতা	৭২
সাহিত্যে বিচরণ	৭৪
আধ্যাতিক নেতৃত্ব	৮২
ইতিহাসের পট পরিবর্তন	৮৫

ইমাম আজম আবু হানিফা (রহ.)

জন্ম	৮৭
হাম্মাদ (রহ.)-এর মজলিশে	৮৮
বাহ্যিক অবয়ব ও দৃশ্য	৯০
আধ্যাত্মিক পাথেয়	৯৪
দুনিয়াবিমুখ ব্যবসায়ী	৯৭
বিচারকের পদ প্রত্যাখ্যান	৯৯
উত্তম সম্পদ	১০০
যুগ তাঁকে ফকিহ বানিয়েছে	১০২
মাদরাসাতুর রায়-এর প্রতিষ্ঠাতা	১০৫
হানাফি ফিকহের মূলনীতি	১০৬
অকাট্য প্রমাণ	১০৮
ছাত্রদের দেখাশোনা	১১০
আলিমদের সাক্ষ্য	১১১
প্রত্যাখ্যাত কথা	১১৩
অভিযোগ	১১৫
জবানের হেফাজত	১১৯
অন্তিম পথে	১২১

ইমামু দারিল হিজরাহ ইমাম মালেক (রহ.)

শুভ জন্ম	১২২
ইলম অর্জন এবং তাঁর সম্পর্কে আলিমদের সাক্ষ্যদান	১২৩
তরঙ্গ ফকিহ	১২৪
ব্যক্তিত্ব ও সৌন্দর্য	১২৭
যে ক্ষুধার্ত অতৃপ্ত থাকে	১২৯
আমরা দুজনই কল্যাণের পথে	১৩২
ইমাম মালেক ও লাইস ইবনে সাদ (রহ.)-এর মাঝে পত্র বিনিময়	১৩৪
লাইস ইবনে সাদের প্রতি ইমাম মালেক (রহ.)-এর পত্র	১৩৪
লাইস ইবনে সাদ (রহ.)-এর পত্র	১৩৮
আমিরুল মুমিনিন, তাদের ছেড়ে দিন	১৪৫
আপনি এমনটা করবেন না	১৪৯
নেতৃত্ব দেওয়ার আগে যোগ্যতা অর্জন করুন	১৫০
জটিল প্রশ্ন	১৫২

অধ্যয়োজ্ঞীয় বিদ্যা	১৫৪
আমি জানি না	১৫৭
আলিমের মর্যাদা	১৫৯
ইমাম মালেক (রহ.)-এর কঠিন পরীক্ষা	১৬৩
ব্যক্তিত্ব ও উপেক্ষা	১৬৭
নীরবতা ও গৃহে অবস্থান	১৬৮
আল্লাহর আদেশ	১৭৫

ইমাম শাফেয়ি (রহ.) খোদা-খেমিক প্রাজ্ঞ ফকিহ ও দার্শনিক

জীবনকাহিনি	১৭৭
ইলমের প্রতি তীব্র আগ্রহ	১৭৯
প্রাজ্ঞ ফকিহ	১৮২
ভাষা, সাহিত্য ও শৈলী	১৮৪
অমূল্য বাণী	১৮৫
বিতর্কের শিষ্টাচার : তর্কের সৌন্দর্য	১৮৭
পক্ষপাতিত্ব ও নিরপেক্ষতা	১৯১
অনুপম চরিত্রের অধিকারী	১৯৩
মানবিকতা ও বদান্যতা	১৯৭
স্বাধীনতার প্রতি আহ্বান	১৯৮
রহস্যকথা	২০০
শাফেয়ি (রহ.)-এর প্রতি শিয়া অপবাদ	২০১
শাফেয়ি (রহ.)-এর প্রতি মুতাজিলার অপবাদ	২০২
পুরাতন ও নতুন মত	২০৪
ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-এর মত পরিবর্তনের কারণ	২০৪
‘আর-রিসালাহ’ গ্রন্থ	২০৬
গুণকীর্তন	২০৯
ইন্ডেকাল	২১০

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)

জন্ম ও জন্মস্থান	২১২
ইলম অর্জনের জন্য ভ্রমণ	২১২
আমৃত্যু জ্ঞানসাধক	২১৪
মনাবীদের চোখে আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)	২১৫

ভেতর-বাইরের সৌন্দর্য	২১৬
তাকসির ও হাদিসের প্রতি গুরুত্ব	২১৮
ফকিহ ইমাম আহমদ	২২০
নব জাগরণ ও অনুসরণ	২২১
যশ-খ্যাতির পরীক্ষা	২২২
তাহাজ্জুদে মগ্ন রজনী	২২৫
ইমাম আহমদ (রহ.)-এর খোদাতীর্থতা	২২৭
দুনিয়ার সাথে আমার কী সম্পর্ক	২২৮
নবিদের চরিত্র	২৩৪
ইমাম আহমদ (রহ.) ও জনসাধারণ	২৩৫
খালকে কুরআনের ফিতনা	২৩৭
মামুনের যুগে	২৩৭
মুতাসিমের যুগে	২৩৯
ওয়াসেকের যুগে	২৪২
ইমাম আহমদ (রহ.)-এর জীবন : দীপিত আলোকমালা	২৪৩
ক্ষমা ও আপসের অনুপম দৃষ্টান্ত	২৪৫
সমসাময়িক আলিমদের সান্নিধ্যে	২৪৬
ইমাম শাফেয়ি (রহ.)	২৪৬
ইবনে হুমাম আল ইয়ামানি আস সানআনি (রহ.)	২৪৮
ইবনু আবি দুআদ	২৪৯
ইন্তেকাল ও জানাজা : ভক্তি ও ভালোবাসার অপূর্ব ছবি	২৫১

□

উম্মাহর পথিকৃৎ ইমামগণ

যুগ সন্ধিক্ষণ

সমগ্র মুসলিম উম্মাহর পথিকৃৎ চার ইমামের আবির্ভাব ঘটেছিল ইতিহাসের এক সোনালি যুগে। ইতিহাসের পাতায় চোখ বোলালে সে সময়ের দুটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়—

প্রথম, আত্মপরিচয়, ব্যক্তিত্ব সংরক্ষণ, আকিদা-বিশ্বাস, ইবাদত-বন্দেগি, চালচলন ও জীবনযাপনে ইসলামি মূল্যবোধকে আঁকড়ে ধরা। এই ইসলামি মূল্যবোধের মাঝেই নিহিত আছে উম্মাহর শ্রেষ্ঠত্ব, শক্তি ও সামর্থ্য। নিহিত আছে উম্মাহর মাহাত্ম্য, শিক্ষার মৌলিকত্ব ও সভ্যতা-সংস্কৃতির ভিত্তি। চার ইমাম কর্তৃক চার মাজহাবের পথচলার মাধ্যমে ইসলামের ইতিহাসে এক নবযাত্রার সূচনা হয়। এতে অনুসরণ, সম্পর্ক নবায়ন ও মানহাজ প্রতিষ্ঠার দাবি ফুটে ওঠে।

চার ইমামের মান-মর্যাদা ও অবস্থান ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত ও সুনির্ধারিত। এই সম্মান শুধু তাঁদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তাঁদের বোধশক্তি, পাণ্ডিত্য, গবেষণা ও কুরআন-সুন্নাহ থেকে বিভিন্ন মাসয়ালার সমাধান বের করার যোগ্যতা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও সুবিস্তৃত।

দ্বিতীয়, পরবর্তী পরিস্থিতিতে বিভিন্ন সমস্যা ও সংকট মোকাবিলা করার মানসিকতা লালন করা। মানবজীবনে সমস্যা ও সংকটের আবর্তন সৃষ্টিজগতে আল্লাহ তায়ালার একটি চিরায়ত নিয়ম ও দস্তুর। মানুষের জীবনে এই সমস্যা ও সংকট বহুতা নদীর মতো, যার স্রোত কখনো থামতে জানে না। উম্মাহর পরিধি যত বড়ো হবে, এই সমস্যা ও সংকটের মাত্রাও তত বৃদ্ধি পাবে। দিন দিন উম্মাহর পরিসর বাড়ছে। প্রতিদিন অনেকে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিচ্ছে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নয়নে পরিবেশ-পরিস্থিতিতেও ব্যাপক পরিবর্তন আসছে। মুসলমানরা নতুন নতুন জাতির সাথে মেলামেশা করছে। ফলে নিত্য-নতুন সমস্যা ও সংকট তৈরি হচ্ছে। এই সমস্যা ও সংকট মোকাবিলা করা প্রয়োজন।

চার ইমাম ছিলেন নববি যুগ, কুরআন অবতীর্ণের যুগ ও সাহাবিদের যুগের কাছাকাছি সময়ের। ফলে তাঁরা রাজনীতি ও সভ্যতার উন্নত যুগের সাথে সেতুবন্ধন স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ইজমার যুগ

চার ইমামকে উম্মাহর সবাই ইমাম হিসেবে মেনে নিয়েছে। এটা কাকতালীয়ভাবে ঘটেনি। তাঁদের অবস্থান, মান-মর্যাদা ও অবদান পুরো মুসলিম জাতির ঐক্যের ভিত্তিতে স্বীকৃত। পুরো মুসলিম

জাতি ফিকহি ও আকিদাগত বিষয়ে তাঁদের অনুসরণ করে আসছে। ফিকহি মাসয়ালা সমাধানের জন্য তাঁদের ওপরই নির্ভর করছে।

প্রত্যেক ইমামের কিছু অনুসারী সুনির্দিষ্ট। ইমামদের মধ্যে শাখাগত বিষয়ে মতপার্থক্য থাকলেও ঈমান, মাসয়ালা উদ্ঘাটন ও ইজতিহাদের মৌলিক নিয়মনীতিতে কারও দ্বিমত নেই। এর অর্থ হলো—উম্মাহ সামগ্রিকভাবে যদিও চার ইমামের অনুসারী, তারপরও তাদের মাঝে মাসয়ালায় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিয়ে কিছু মতপার্থক্য রয়েছে।

ফিকহি বিষয়ে ইমামদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকা দৃশ্যীয় নয়। এটি শরিয়াহর প্রশস্ততা ও উদারতার বহিঃপ্রকাশ। আর ফিকহি বিষয়ে ইমামদের মধ্যে মতবিরোধের তুলনায় ঐকমত্যের পরিমাণ বেশি।

মূল ও শাখা-প্রশাখা

চার ইমামের গবেষণাকর্ম পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মৌলিক ও বুনিয়াদি বিষয়গুলোতে তাঁরা সকলেই একমত; মতপার্থক্য তৈরি হয়েছে মূলত শাখা-প্রশাখাগত আলোচনায়।

ইমামগণ যে মাসয়ালায় ইখতিলাফ করেছেন, সেটা আদতেই মতভেদপূর্ণ মাসয়ালা। তাঁদের এই মতভেদ পরবর্তী প্রজন্মের জন্য ইখতিলাফের পথ সুগম করেছে। ইমামদের মাজহাবে যে মতামত রয়েছে, তা নির্ভরযোগ্য মতামত। এসব মতামত আলিমদের পদস্থলন কিংবা বিচ্ছিন্ন কোনো মতামত নয়; বরং যথার্থ মূলনীতির ভিত্তিতে কুরআন-সুন্নাহর যৌক্তিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ।

কোনো মাসয়ালায় যখন ইমামগণ ইজতিহাদ করেন, তখন একজনের মতই কেবল সঠিক হয়; বাকিদের মত সঠিক না হলেও তাঁরা ইজতিহাদের সওয়াব পেয়ে যান। মাসয়ালায় ইমামদের মতভেদ, দৃষ্টিভঙ্গি, প্রমাণ-পদ্ধতি ইত্যাদিই বলে দেয়—এই মাসয়ালায় মতভেদ করার সুযোগ রয়েছে। এই মাসয়ালায় মতভেদ অনুমোদিত। ব্যাপারটা এ রকম—মাসয়ালাটি মতভেদপূর্ণ বলেই তাঁরা মতভেদ করেছেন। তবে মতভেদের ক্ষেত্রে তাঁরা একে অন্যের মত প্রত্যাখ্যান করেননি; বরং পরস্পরের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করেছেন। ইমামদের মতভেদের কারণে একটি মাসয়ালায় অনেকগুলো দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে।

খলিফা আবু জাফর আল মনসুর মালেকি মাজহাবকে গ্রহণযোগ্য মাজহাব হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তা সমস্ত নগরীতে ছড়িয়ে দিতে মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু ইমাম মালেক (রহ.) তাকে বাধা দিয়ে বলেছিলেন—‘আমিরুল মুমিনিন! এ রকম করবেন না। মানুষের কাছে আগে থেকেই কিছু মত পৌঁছেছে। আগে থেকে তারা কিছু হাদিস শুনেছে। ভিন্ন ভিন্ন হাদিস ও ভিন্ন ভিন্ন ফিকহি মত তারা বর্ণনা করেছে। প্রত্যেক দলের কাছে যা আগে পৌঁছেছে, তা তারা গ্রহণ করেছে। তার ওপর আমল করেছে। রাসূল ﷺ-এর সাহাবিদের মাঝেও মাসয়ালাগত মতভেদ ছিল। লোকজন তা মেনে নিয়েছে। তারা যা বিশ্বাস করেছে, তা থেকে তাদের ফিরিয়ে আনা কঠিন ও দুষ্কর। আপনি তাদের

নিজ অবস্থায় ছেড়ে দিন। তারা যে বিশ্বাস ও মতের ওপর আছে, তা নিয়ে থাকতে দিন। প্রত্যেক এলাকার মানুষ নিজেদের জন্য যা পছন্দ করেছে, তা নিয়েই তাদের থাকতে দিন।’

ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ আল আনসারি (রহ.) বলতেন—‘আলিমগণ স্বভাবতই উদারমনা। বিভিন্ন মাসয়ালা নিয়ে তাঁরা মতভেদের মধ্যে আছে, থাকবে। একজন হালাল বললে অন্যজন বলে হারাম। তাঁরা হালাল-হারাম বর্ণনার মাঝে থাকলেও কখনো একে অন্যকে দোষারোপ করেন না। পরস্পরকে প্রতিপক্ষ বানানো আলিমদের স্বভাব নয়।’^১

ইমামদের মতভেদের পূর্বে সাহাবিরাও মতভেদ করেছেন। তাঁদের এই মতভেদ ছিল রহমতস্বরূপ। আর ঐকমত্য ছিল অকাট্য প্রমাণ; যেমনটা ইবনে কুদামা (রহ.) বলেছেন।^২

উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহ.) বলেন—

‘রাসূল ﷺ-এর সাহাবিগণ মতভেদ না করুক, এমনটা আমার কাছে পছন্দনীয় নয়; বরং তাঁদের মতভেদেই আমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। কারণ, তাঁরা মতভেদ না করলে আমাদের জন্য কোনো ছাড় থাকত না।’^৩

ইসহাক ইবনে বাহলুল আল আনবারি একবার একটা কিতাব নিয়ে ইমাম আহমদ (রহ.)-এর কাছে এসে বলেন—‘আমি এতে সকল মতভেদকে একত্র করেছি এবং এর নাম দিয়েছি কিতাবুল ইখতিলাফ।’ ইমাম আহমদ (রহ.) বললেন—‘এর নাম কিতাবুল ইখতিলাফ না রেখে নাম রাখো কিতাবুস সাআ তথা প্রশস্ততার কিতাব।’^৪

তালহা ইবনে মুসাররিফের কাছে মতভেদ বা ইখতিলাফের কথা বলা হলে তিনি বলতেন—‘ইখতিলাফ বলো না; বলো প্রশস্ততা বা ব্যাপকতা।’^৫

ভিন্নমত পোষণকারীর প্রতি উদারতা প্রদর্শন করা এবং অন্যের মত খোলা মনে গ্রহণ করে নেওয়া মহান চরিত্রের পরিচায়ক। মহান ইমামগণ এই চরিত্রেরই অধিকারী ছিলেন। তাঁদের মাঝে ছিল আকাশসম উদারতা। মনে ছিল না কোনো সংকীর্ণতা। তাঁদের এই উদারতা ও প্রশস্ততা সকলকে বিমোহিত করে।

^১ ইমাম জাহাবি, তাজকিরাতুল হুফফাজ : খণ্ড.-১, পৃ.-১০৫; আল মাকাসিদুল হাসানা : পৃ.-৭০; কাশফুল খিফা : খণ্ড.-১, পৃ.-৭৫

^২ লাময়াতুল ইতিকাদ : পৃ.-৪২

^৩ আল ইবানাতুল কুবরা, পৃ.-৭০৩; আল ফকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ : খণ্ড.-২, পৃ.-১১৬; ফয়জুল কাদির : খণ্ড. ১, পৃ.-২০৯

^৪ তবাকাতুল হানবিলা : খণ্ড.-১, পৃ.-২৯৭; মাজমুউল ফতোয়া : খণ্ড.-১৪, পৃ.-১৫৯; আল-মাকসাদুল আরশাদ : খণ্ড. ১, পৃ.-২৪৮

^৫ আল ইবানাতুল কুবরা : খণ্ড. ২, পৃ.-৫৬৬; আবু লাইস সমরকান্দি, বুসতানুল আরিফিন, পৃ.-৩০৮; হিলয়াতুল আউলিয়া : খণ্ড. ৫, পৃ.-১৯; আস-সাওদাতু ফি উসুলিল ফিকহি : পৃ.-৪৫০; আশ-শারানি, আত-তাবকাতুল কুবরা : খণ্ড.-১, পৃ.-৩৭

ইমাম আজম আবু হানিফা (রহ.)

তিনি হলেন আবু হানিফা আন নুমান ইবনে সাবিত।^৬

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর জন্মস্থান নিয়ে জীবনীকারদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। তাঁর জন্ম হয়েছিল কাবুলে না বাবেলে, নাসাতে না তিরমিজে নাকি আনবারে—এ নিয়ে মতামতের শেষ নেই।

অনেকের ধারণা, তিনি মূলত এসব অঞ্চলে ভ্রমণ করেছেন, তাই এ দিকে সম্বন্ধ করে এমনটা বলা হয়েছে। কিন্তু তাদের এই ধারণা সত্য হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।^৭

খতিব বাগদাদি (রহ.) বর্ণনা করেন, ইসমাইল ইবনে হাম্মাদ ইবনে আবি হানিফা (রহ.) বলতেন—‘আমি ইসমাইল ইবনে হাম্মাদ ইবনে নুমান ইবনে সাবিত ইবনে নুমান ইবনে মারজুবান। স্বাধীন পারসিকদের অন্তর্ভুক্ত। আমরা কখনো দাসত্ববরণ করিনি। ৮০ হিজরিতে আমার দাদা ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর জন্ম। আমার পরদাদা সাবিত শৈশবে আলি (রা.)-এর দরবারে গিয়েছিলেন। আলি (রা.) তাঁর ও তাঁর অনাগত বংশধরদের জন্য বরকতের দুআ করেছিলেন। আমরা আল্লাহর কাছে আশাবাদী, তিনি আমাদের ব্যাপারে আলি (রা.)-এর দুআ কবুল করেছেন।’^৮

ইসমাইল ইবনে হাম্মাদের এ বর্ণনা উল্লেখ করে আস-সিরাজ আল হিন্দি^৯ বলেন—‘ইসমাইলের ভাইও এ রকম বলেছেন। তাই কারও জন্য এমন ধারণা করা ঠিক হবে না যে, নিজেদের সুমহান মর্যাদা ও পরহেজগারিতা সত্ত্বেও তারা নিজ পিতা ছাড়া অন্য কারও দিকে নিজেদের সম্বন্ধযুক্ত করে থাকতে পারেন।’^{১০}

জন্ম

আবদুল কাদের আল কুরাশি বলেন—‘৮০ হিজরিতে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) জন্মগ্রহণ করেন। এটাই সঠিক মত।’^{১১}

ইমাম জাহাবি (রহ.) বলেন—‘ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ৮০ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। সে সময় সাহাবিদের অনেকে জীবিত ছিলেন। আনাস ইবনে মালেক (রা.) কুফায় আগমন করলে

^৬ তাহজিবুল আসমা ওয়াল লুগাত : খণ্ড-২, পৃ.-৫০১; তাহজিবুল কামাল : খণ্ড-২৯, পৃ.-৪২২; সিয়্যারু আলামিন নুবালা : খণ্ড-৬, পৃ.-৩৯০

^৭ আজ জামিরি, আখবারু আবি হানিফাতা ওয়া আসহাবিহি, পৃ.-১৫; তারিখে বাগদাদ : খণ্ড-১৩, পৃ.-৩২৬; ইবনে খল্লিকান, ওফিয়াতুল আয়ান : খণ্ড-৫, পৃ.-৪০৫

^৮ তারিখে বাগদাদ : খণ্ড-১৩, পৃ.-৩২৭

^৯ প্রকৃত নাম উমর ইবনে ইসহাক ইবনে আহমদ আল গজনবি। তবে আবু হাফস আল হিন্দি আল মিশরি নামেই তিনি সমধিক পরিচিত। তিনি হানাফি মাজহাবের ফকিহ ছিলেন। ৩৭৩ হিজরিতে তিনি মিশরে মারা যান।

^{১০} আত-তবাকাতুস সুন্নিয়া ফি তারাজিমিল হানাফিয়া : খণ্ড-১, পৃ.-৮৭

^{১১} সিয়্যারু আলামিন নুবালা : খণ্ড-৬, পৃ.-৩৯১; আল জাওয়াহিরিল মাজিয়া ফি তবাকাতিল হানাফিয়া : খণ্ড-১, পৃ.-৫৩

তঁার সাথে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সাক্ষাৎ করেন। তবে কোনো সাহাবি থেকে তঁার কিছু বর্ণনা করার বিষয়টি প্রমাণিত নয়।’

আবদুল কাদের আল কুরাশি বলেন—‘অনেকে দাবি করে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) আটজন সাহাবি থেকে শুনেছেন ও বর্ণনা করেছেন। এই বিষয়কে কেন্দ্র করে অনেকে আলাদা আলাদা গ্রন্থও রচনা করেছেন।^{১২} এ ধরনের কিছু কথা আমরাও আমাদের শাইখ থেকে শুনেছি ও বর্ণনা করেছি। এ বিষয়ে আমি নিজেও একটি গ্রন্থ রচনা করেছি। তাতে উল্লেখ করেছি, তিনি কোন সাহাবি থেকে শুনেছেন, আর কোন সাহাবিকে দেখেছেন। খতিব বাগদাদি (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছি, তিনি আনাস ইবনে মালেক (রহ.)-কে দেখেছেন। আর যারা বলেছেন তিনি তাঁকে দেখেননি, আমি তাদের মতও খণ্ডন করেছি।’^{১৩}

হাম্মাদ (রহ.)-এর মজলিশে

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) হাদিস ও ফিকাহ চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। অসংখ্য তাবেয়ির কাছ থেকে ইলম অন্বেষণ করেন। নিজেকে সমৃদ্ধ করেন জ্ঞান-গরিমায়। এমনকী তিনি একজন বড়োমাপের অনুসরণীয় ইমামে পরিণত হন।

শৈশবেই তিনি ইলম অর্জনে আত্মনিয়োগ করেননি। এ সময় ব্যাবসা-বাণিজ্য করার জন্য তিনি বাজারে যেতেন। একদিন আমির ইবনে শারাহিল আশ-শাবি তাঁকে নসিহত করেন। ইলম অর্জনের প্রতি তাঁকে উৎসাহিত করেন।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) কীভাবে ইলম অর্জনে ব্রতী হন, তা তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন—‘একদিন আমি ইমাম শাবি (রহ.)-এর পাশ দিয়ে বাজারে যাচ্ছিলাম। তিনি আমাকে ডেকে বললেন—“তুমি কোথায় যাচ্ছ?” আমি বললাম—“বাজারে যাচ্ছি।” তিনি বললেন—“আমি তোমার বাজারে যাওয়ার কথা জানতে চাইনি। আমি জানতে চেয়েছি, তুমি কোন আলিমের কাছে যাচ্ছ?” আমি বললাম—“আলিমদের মজলিশে আমার আসা-যাওয়া কম।”

তিনি বললেন—“তুমি আলিমদের থেকে বিমুখ হয়ো না। তাঁদের সান্নিধ্য গ্রহণ করো। তাঁদের থেকে ইলম অর্জন করো। আমি তোমার মাঝে ভালো কিছু দেখতে পাচ্ছি। ইলম সংরক্ষণের উপযুক্ত পাত্র তোমার মাঝে রয়েছে। আমি তোমার মাঝে সজীবতা ও সচেতনতা লক্ষ্য করছি।”

“তঁার কথাটি আমার মনে ধরে। আমার হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করে। আমি বাজারে যাওয়া বাদ দিয়ে ইলম অর্জন শুরু করি। তঁার নসিহা দ্বারা আল্লাহ আমায় উপকৃত করেন।”^{১৪}

^{১২} আবু মাশার আবদুল করিম বিন আবদুস সামাদ তাবারি তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ৪৭৮ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। দ্র. ইমাম সুয়ুতি, তাবয়িদুস-সহিফা ফি মানাকিবিল ইমাম আবু হানিফা : পৃ.-১৩

^{১৩} তারিখে বাগদাদ : খণ্ড-১৩, পৃ.-৩২৫; সিয়রু আলামিন নুবালা : খণ্ড-৬, পৃ.-৩৯১; আল জাওহিরিল মাজিয়া ফি তবাকাতিল হানাফিয়া : খণ্ড-১, পৃ.-৫৩

^{১৪} মুওয়াফফিক ইবনে আহমদ আল মাক্কি : খণ্ড-১, পৃ.-৫৯; ইবনে হাজার হায়তামি, আল খায়রাতুল হাসান ফি মানাকিবিল ইমামিল আজাম আবু হানিফাতান নুমান : পৃ.-২৭

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে তাঁর ইলম অর্জনের সূচনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন—‘আমি ইলম ও ফিকহের খনি হিসেবে খ্যাত কুফা নগরীতে ছিলাম। সেখানের লোকদের সাথে উঠাবসা করলাম। তাদের থেকে একজন বড়ো ফকিহর সান্নিধ্য গ্রহণ করলাম।’

যার অবদানে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম ও ফকিহে পরিণত হন, তিনি হলেন হাম্মাদ ইবনে আবু সোলায়মান (রহ.)। দীর্ঘ ১৮ বছর তাঁর সান্নিধ্যে থেকে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ইলম অর্জন করেছেন। এ সুদীর্ঘ সময়ে ইমাম হাম্মাদ (রহ.) তিলে তিলে আবু হানিফা (রহ.)-কে গড়ে তুলেছেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব গঠনে অবদান রেখেছেন।

আবু হানিফা (রহ.) হাম্মাদ (রহ.)-এর মজলিশে বসা শুরু করলেন। ওস্তাদ হাম্মাদ (রহ.) তাঁর মাঝে দেখতে পেলেন প্রচণ্ড ধীশক্তি, ইলমের প্রতি অদম্য আগ্রহ। তিনি আরও দেখলেন, তাঁর মাঝে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা অন্যদের থেকে তাঁকে আলাদা করে। তাই তিনি বলে দিলেন, ‘আমার মজলিশের প্রথম সারিতে, আমার সম্মুখে যেন আবু হানিফা ছাড়া আর কেউ না বসে।’

আবু হানিফা (রহ.) বলেন—‘আমি ১০ বছর আমার ওস্তাদ হাম্মাদ (রহ.)-এর সান্নিধ্যে থেকেছি। এরপর ইলমের নেতৃত্বের আসনে বসার জন্য আমার মনে আগ্রহ সৃষ্টি হলো। ইচ্ছে হলো, তাঁর সান্নিধ্য ত্যাগ করে নিজেই একটা মজলিশ বানিয়ে দারস দেওয়া আরম্ভ করি।’

ইলমের নেতৃত্ব গ্রহণের আগ্রহের কথা ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এখানে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। এটি ছিল তাঁর সরল মনের বহিঃপ্রকাশ। ইমাম হানিফা (রহ.)-এর সমবয়সি যুবকরা যেখানে ইলমের নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হওয়ার জন্য লৌকিকতার আশ্রয় নিত, নিজেদের মজলিশ আলাদা করে বিশুদ্ধ নিয়াতের বুলি আওড়াত, সেখানে তিনি কোনো লৌকিকতার আশ্রয় না নিয়ে স্পষ্টভাবে মনের অবস্থা তুলে ধরেছেন।

প্রিয় পাঠক! ইমাম হানিফা (রহ.) কীভাবে শিক্ষকতার আসনে আসীন হলেন, তা তাঁর মুখ থেকেই শোনা যাক। তিনি বলেন—‘একদিন বিকালে আমি বাড়ি থেকে বের হলাম। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম, আজই ইলমের মজলিশ করে আমি আলাদা দারস দেওয়া শুরু করব। কিন্তু মসজিদে এসে আমার ওস্তাদ হাম্মাদ (রহ.)-কে দেখে তাঁর থেকে আলাদা বসতে আমার মন সায় দিলো না। তাই তাঁর মজলিশেই বসে গেলাম।’

সেদিন রাতে বসরা থেকে ওস্তাদ হাম্মাদ (রহ.)-এর জনৈক আত্মীয়ের মৃত্যুর খবর এলো। সে মৃত্যুর সময় অনেক সম্পত্তি রেখে যায়। হাম্মাদ (রহ.) ছাড়া তার আর কোনো উত্তরাধিকার ছিল না। তাই তিনি আমাকে তাঁর স্থানে বসার আদেশ করে বসরা চলে গেলেন।’

ইমামু দারিল হিজরাহ ইমাম মালেক (রহ.)

ইমাম মালেক (রহ.)। ক্ষণজন্মা একজন মনীষী। যুগশ্রেষ্ঠ আলিম। বিশাল এক জ্ঞানবৃক্ষ। দিগ্দিগন্তে ছড়িয়ে আছে তাঁর ইলমের বিস্তৃতি। মানুষের মুখে মুখে আলোচিত হয় তাঁর যশ-খ্যাতি। যাদের মাজহাবকে আল্লাহ স্থায়িত্ব দিয়েছেন, তিনি তাঁদের একজন। যাদের স্মরণে আল্লাহর রহমত নাজিল হয়, তিনি তাঁদের অন্তর্ভুক্ত।

শুভ জন্ম

তাঁর নাম মালেক ইবনে আনাস ইবনে মালেক ইবনে আবু আমের আল আসবাহি আল মাদানি। ৯৩ হিজরিতে এই মহান মনীষী জন্মগ্রহণ করেন। অন্যদিকে তাঁর মৃত্যুর বছরেই আল্লাহর রাসূলের প্রিয়তম সাহাবি আনাস ইবনে মালেক (রা.) ইন্তেকাল করেন।

সুনান গ্রন্থগুলোতে ও মুসনাদে আহমাদে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন—

‘শীঘ্রই মানুষরা উট হাঁকিয়ে ইলম অন্বেষণে বেরিয়ে পড়বে; কিন্তু তারা মদিনার আলিমের চেয়ে বড়ো জ্ঞানী আর কাউকেই পাবে না।’

ইমাম তিরমিজি (রহ.) হাদিসটিকে হাসান বলেছেন। ইবনে হিব্বান (রহ.) ও হাকিম (রহ.) হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন। ইমাম জাহাবি (রহ.) বলেন— ‘হাদিসটির সনদ স্পষ্ট ও পরিষ্কার। তবে এর মতন (ট্যাক্সট) অখ্যাত।’

ইবনে উয়াইনা ও ইবনে জুরাইজের মতো বেশ কিছু আলিম হাদিসটিকে ইমাম মালেক (রহ.)-এর ওপর প্রয়োগ করেছেন। অর্থাৎ হাদিসে বর্ণিত সুসংবাদ দ্বারা তাঁরা ইমাম মালেক (রহ.)-কে উদ্দেশ্য করেছেন। আর তিনি ন্যায়পরায়ণতা, ইলমে হাদিস ও ফিকহের নেতৃত্বের কারণে হাদিসে বর্ণিত সুসংবাদের উপযুক্তও বটে।

ইলম অর্জন এবং তাঁর সম্পর্কে আলিমদের সাক্ষ্যদান

প্রায় দুই শতাব্দিক তাবেয়ি থেকে ইমাম মালেক (রহ.) হাদিস বর্ণনা করেছেন। ইমাম শাফেয়ি (রহ.) বলেন—‘আসার (সাহাবি-তাবেয়ির বাণী)-এর আলোচনা এলে ইমাম মালেক (রহ.)-কে সেখানে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো মনে হয়।’

ইয়াহইয়া ইবনু মায়িন (রহ.) বলেন-‘ইমাম মালেক (রহ.) হলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে সৃষ্টিজগতের জন্য এক উজ্জ্বল প্রমাণ।’

ইমাম মালেক (রহ.) থেকে অসংখ্য মানুষ হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর রচিত বিখ্যাত হাদিসগ্রন্থ আল মুয়াত্তা সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ি (রহ.) একটি চমৎকার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন-‘পৃথিবীর বুকে মালেক (রহ.)-এর আল মুয়াত্তার চেয়ে বিশুদ্ধ কোনো হাদিসগ্রন্থ আছে বলে আমার জানা নেই।’

ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-এর এ কথা বলার সময় বুখারি ও মুসলিম সংকলিত হয়নি। সে সময় ইমাম মালেক (রহ.)-এর আল মুয়াত্তা ছিল সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ। হাদিস, আসার (সাহাবি-তাবেয়ির বাণী), ফিকাহ ইত্যাদির সবকিছুই এ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ইমাম শাফেয়ি (রহ.) বলেন-‘ইমাম মালেক ও সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (রহ.) ছিলেন পরস্পর বন্ধু। তাঁরা দুজন না থাকলে হেজাজ থেকে ইলম চলে যেত।’

তিনি আরও বলেন-‘ইমাম মালেক (রহ.) থেকে কোনো হাদিস পেলে তা শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো। কারণ, তিনি নির্ভরযোগ্য। তাঁর হাদিস বিশুদ্ধ ও দলিল হিসেবে উপস্থাপন যোগ্য।’

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (রহ.) বলেন-‘ইমাম মালেক (রহ.) ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম।’

ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ আল কাত্তান (রহ.) ও ইয়াহইয়া ইবনে মায়িন (রহ.) বলেন-‘ইমাম মালেক (রহ.) হাদিসের জগতে আমিরুল মুমিনিন।’

ইবনে ওয়াহব (রহ.) বলেন-‘ইমাম মালেক (রহ.) না থাকলে আমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যেতাম।’

আবু কুদামা উবাইদুল্লাহ ইবনে সাইদ আল হাফেজ বলেন-‘তিনি ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ হাফিজুল হাদিস।’

ইমাম মালেক (রহ.)-এর ফিকাহ দিগন্তজুড়ে বিস্তৃত। বিশেষ করে মরক্কো, স্পেন, মিশর, আলজেরিয়া, লিবিয়া, তিউনিসিয়া, মৌরিতানিয়া, সিরিয়া, ইয়েমেন ও সুদানের অধিকাংশ এলাকার মানুষ তাঁর মাজহাবের অনুসারী। আর বাগদাদ, কুফা, খোরাসান ও আরব উপদ্বীপের কিছু এলাকার মানুষ মালেকি মাজহাবের অনুসারী। আজও তাঁর মাজহাব পৃথিবীতে স্থায়িত্ব লাভ করা মাজহাব চতুষ্টয়ের একটি।

তরুণ ফকিহ

ইমাম মালেক (রহ.) ১০ বছর বয়সে ইলম অর্জন শুরু করেন। ১৮ বছর হওয়ার আগেই তিনি ফতোয়া প্রদানের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ২১ বছর বয়সে ইলম শেখানোর জন্য তিনি শিক্ষকের মসনদে বসেন। ইলম শিক্ষাদান শুরু করেন। যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি হাদিস বর্ণনা শুরু করেন। খলিফা আবু জাফর আল মানসুরের খিলাফতের শেষ দিকে, লোকজন দিগ্দিগন্ত থেকে হাদিস

শোনার জন্য ইমাম মালেক (রহ.)-এর কাছে আসতে শুরু করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর আঙিনায় লোকজনের এ আগমন অব্যাহত থাকে।

এ থেকে বোঝা যায়, সালফে সালেহিনের যুগে ইমাম মালেক (রহ.) কেমন পরিবেশে বেড়ে উঠেছিলেন। এখানে আমাদের জন্য কিছু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। যথা—

এক. ইমাম মালেক (রহ.) মদিনা থেকে ইলম অর্জন করেছেন। মদিনাতেই বেড়ে উঠেছেন। তিনি দেখেছেন, হাদিসের শাইখদের কীভাবে সম্মান করা হয়।

তাঁরা যখন সামনে আসত, লোকজন মাথা নিচু করে চুপ থাকত। তাঁদের জন্য পথ ছেড়ে দিত। সালাম দিয়ে তাঁদের সম্মান করত। কেননা, তাঁরা নিজের বক্ষে আল্লাহর রাসূলের হাদিস ও সালেহিনদের ইলম সংরক্ষণ করছেন।

ইমাম মালেক (রহ.)-এর গুণ বর্ণনা করে আবদুল্লাহ বিন সালিম আল খায়্যাতি বলেন—

يَأْتِي الْجَوَابَ فَمَا يُرَاجِعُ هَيْبَةً وَالسَّائِلُونَ نَوَاصِي الْأَذْقَانِ
أَدَبُ الْوَقَارِ وَعِزُّ السُّلْطَانِ التَّقَى فَهُوَ الْبُطْأُ وَلَيْسَ ذَا سُلْطَانِ

‘তিনি উত্তর না দিলে ভয়ে তাঁকে দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করার সাহস কারও হতো না। আর তাঁর সামনে প্রশ্নকারীরা থাকত অবনত মস্তকে।

তাকওয়ার কারণেই তাঁর এই ব্যক্তিত্ব ছিল। তিনি বাদশাহ না হলেও বাদশার মতোই মানুষরা তাঁর অনুগত ছিল। মানুষের কাছে তাঁর বাদশার মতোই সম্মান ছিল।’^{১৫}

ইমাম শাফেয়ি (রহ.) বলেন—‘ইমাম মালেক ইবনে আনাসের মজলিশে দেখেছি, তিনি কী পরিমাণ ইলমকে সম্মান করেন। কী পরিমাণ ইলমকে ভালোবাসেন। আমি দেখেছি, ইলমের সাথে ইমাম মালেক (রহ.)-এর সম্পর্ক সুগভীর। আমি দেখেছি, তাঁর ব্যক্তিত্ব। তাঁর ব্যক্তিত্বের সামনে আমি ভীত-সম্ভ্রান্ত হয়ে পড়তাম।

অনেক সময় তাঁর মজলিশে শব্দ করে কিতাবের পৃষ্ঠা উলটাতেও ভয় পেতাম। এমনভাবে পৃষ্ঠা উলটাতাম, যাতে কোনো শব্দ না হয়।’^{১৬}

দুই. মদিনার পরিবেশ ছিল ইলমি পরিবেশ। মদিনায় ইলম অর্জনের পথে কোনো বাধা-বিপত্তি ছিল না। ছিল না কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতি। মসজিদের দরজাগুলো সব সময় খোলা থাকত তালিবুল ইলমদের জন্য। সেখানে তাদের জন্য থাকত যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা। প্রস্তুত থাকত ইলমি মজলিশ।

^{১৫} আল জাহিজ, আল হাইওয়ান : খণ্ড-৩, পৃ.-২৩৮; মুবাররাদ, আল কামিল : খণ্ড-৩, পৃ.-২১০; সায়ালাবি, সিমারুল কলব : পৃ.-৬৮৩

^{১৬} ইমাম বায়হাকি, মানাকিবুশ-শাফেয়ি : খণ্ড-২, পৃ.-১৪৪; তারিখু দিমাশক : খণ্ড-১৪, পৃ.-২৯৩; ইমাম নববি, আল মাজমু : খণ্ড-১, পৃ.-৩৬

ইমাম শাফেয়ি (রহ.) খোদা-প্রেমিক প্রাজ্ঞ ফকিহ ও দার্শনিক

উক্ত শিরোনাম আমার চিন্তার ফসল নয়, ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-কে নিয়ে ইমাম আহমদ (রহ.)-এর মন্তব্যবিশেষ। ইমাম আহমদ (রহ.) বলেন—‘ইমাম শাফেয়ি চারটি বিষয়ে তাত্ত্বিক ছিলেন—ভাষা, অর্থালংকার, ফিকাহ ও ইমামগণের মতভেদ।’^{১৭}

এটা স্পষ্ট যে, ইমাম আহমদ (রহ.)-এর এই মন্তব্য এ কথা বোঝায় না, ইমাম শাফেয়ি (রহ.) শুধু এ বিষয়গুলোই জানতেন। এই চার বিষয় ছাড়াও জ্ঞানের অন্যান্য শাখাতেও তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল। তবে ফিকাহশাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল সর্বাধিক। দর্শনশাস্ত্রেও তাঁর পাণ্ডিত্য থাকার বিষয়টি বিস্ময়ের নয়।

এ বক্তব্যে ‘দর্শন’ শব্দটির প্রতি কঠোর দৃষ্টি দেবেন না, কথাটাকে জটিলভাবে নেবেন না। কারণ, এখানে যে দর্শনের কথা বলা হয়েছে, তা নাস্তিকতা ও সংশয়বাদের সমার্থক নয়। এখানে দর্শন বলতে বোঝানো হচ্ছে কোনো বিষয়ের গভীর জ্ঞান এবং তার বাস্তবতা উপলব্ধি করা। কোনো কিছুই অন্তর্নিহিত বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়া।

ইমাম শাফেয়ি (রহ.) ছিলেন মুত্তাকি মানুষ। তিনি ইবাদত-বন্দেগি ও ইলম অন্বেষণে নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন। সমগ্র রাতকে তিনি তিন অংশে ভাগ করে নিতেন। এক অংশে ইলম চর্চা করতেন, অন্য অংশে নফল নামাজ ও তাহাজ্জুদে মগ্ন থাকতেন এবং বাকি অংশে ঘুমাতে।^{১৮}

এর চেয়ে বড়ো ব্যাপার, ইমাম আহমদ (রহ.) ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-কে দ্বিতীয় শতাব্দীর ‘মুজাদ্দিদ’ আখ্যায়িত করেছেন। এই ব্যাপারে রাসূল ﷺ বলেছেন—

‘আল্লাহ তায়ালা প্রতি শতাব্দীর মাথায় এই উম্মতের জন্য একজন মুজাদ্দিদ পাঠান। তিনি ধর্মের মাঝে নবপ্রাণ সঞ্চার করেন।’^{১৯}

ইমাম আহমদ (রহ.) বলেন—‘প্রথম ১০০ বছরের মুজাদ্দিদ হলেন উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহ.)। দ্বিতীয় ১০০ বছরের মুজাদ্দিদ হলেন ইমাম শাফেয়ি (রহ.)।’^{২০}

^{১৭} ইমাম বায়হাকি, মানাকিবুশ-শাফেয়ি : খণ্ড-২, পৃ.-৪১; মারিফাতুস সুন্নাহ ওয়ালা আসার : খণ্ড-১, পৃ.-২০০; তারিখে দামেশক : খণ্ড-৫১, পৃ.-৩৫০

^{১৮} হিলয়াতুল আউলিয়া : খণ্ড-৯, পৃ.-১৩৫; ইমাম বায়হাকি, মানাকিবুশ-শাফেয়ি : খণ্ড-১, পৃ.-২৪২; ফখরুর রাজি, মানাকিবুল ইমামিশ শাফেয়ি : পৃ.-২৫৩; তাহজিবুল আসমা ওয়ালা লুগাত : খণ্ড-১, পৃ.-৫৪

^{১৯} সুন্নাহ আবু দাউদ : ৪২৯১; আল হাকিম : খণ্ড-৪, পৃ.-৫২২; আস সিলসিলাতুস সহিহা : ৫৯৯

^{২০} মারিফাতুস সুন্নাহ ওয়ালা আসার : খণ্ড-৫১, পৃ.-৪২৪; তারিখে দামেশক : খণ্ড-৫১, পৃ.-৩৩৯; আল মাকাসিদুল হাসানাহ, পৃ.-২০৩

জীবনকাহিনি

ইমাম শাফেয়ি (রহ.) প্রথম যা লেখেন, তা হলো আত্মজীবনী। তবে তা মিথ্যা ও বাগাড়ম্বরপূর্ণ কথা মুক্ত ছিল। যে নিজের মান-মর্যাদা ও অবস্থান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, সে-ই প্রকৃতরূপে নিজেকে চিনতে পারে। তাঁর জীবনীতে শৈশব নিয়ে বেশ মজার কিছু কথা আছে। তিনি বলেন—

‘ফিলিস্তিনের গাজা অঞ্চলের আসকালান উপত্যকায় আমি জন্মগ্রহণ করেছি। আমার বয়স দুই বছর হলে মা আমাকে নিয়ে মক্কায় পাড়ি জমান।’^{২১}

কবি মুহাম্মাদ আবদুল গনি হাসান গাজা উপত্যকাকে সম্বোধন করে বলেন—

إذا كنت قدماً للتجارة معرضاً	فأنت بدنياً العلم مصدر عرفان
نميت الإمام الشافعي ولم تزل	له فيك ذكرى وارف العيش فينان
وأهديت للإسلام عالم أمة	وحجة تشريع وصاحب تبيان
وما زال في ترحاله متشوقاً	إليك ومطوي الضلوع بتحنان
يقول وفي أشعاره الصدق والهدى	ولفحة مشتاق ونفحة إنسان
وإني لمشتاق إلى أرض غزة	وإن خاंनी بعد التفرق كئيباني
سقى الله أرضاً لو ظفرت بتربها	كحلت به من شدة الشوق أجفاني

‘হে গাজা উপত্যকা, তুমি কেবল বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র নও, তুমি জ্ঞানের পুণ্যভূমি। কারণ, ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-এর মতো মহাজ্ঞানীকে তুমি আলো-বাতাস দিয়ে বড়ো করেছ। তাঁর স্মৃতিরা এখনও তোমার মাঝে, তোমার প্রতিটি ধূলিকণায় হেঁটে বেড়ায়।’

‘হে গাজা উপত্যকা, তুমি ইসলামকে, মুসলিম উম্মাহকে একজন বিদ্বৎ আলিম দিয়েছ। শরিয়াহর দলিল-প্রমাণ ও বিশদ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন তাঁর যুগে অনন্য।’

‘হে গাজা উপত্যকা, তিনি তোমার থেকে দূরে চলে গেলেও তাঁর হৃদয়ে ছিল তোমার প্রতি অফুরন্ত ভালোবাসা।’

‘হে আমার গাজা উপত্যকা, তিনি কবিতা লিখতেন। কিন্তু তাঁর কবিতা কল্পলোকের খামখেয়ালিতে আকীর্ণ ছিল না। তাতে ছিল সত্যবাদিতা ও হিদায়াতের আলোক রেখা; ছিল আগ্রহ-উদ্দীপনা।’

^{২১} ইবনু আবি হাতিম, আদাবুশ শাফেয়ি ও মানাকিবহি, পৃ.-১৯; ইমাম বায়হাকি, মানাকিবুশ-শাফেয়ি : খণ্ড-২, পৃ.-১২৭-১২৮; তারিখে বাগদাদ : খণ্ড-২, পৃ.-৫৭; তারিখে দামেশক : খণ্ড-৫১, পৃ.-২৮১

‘হে আমার গাজা উপত্যকা, তোমাকে উদ্দেশ্য করে তিনি কী বলেছেন জানো? তিনি বলেছেন—“আমি আমার জন্মভূমি গাজার প্রতি খুবই আকৃষ্ট। যদিও বিচ্ছেদের পর দূরত্বের কারণে তার সাথে আমার আর মিলন হয়নি।

আল্লাহ! সে জমিনে বৃষ্টি বর্ষণ করুন, যার ছোঁয়া পেয়ে আমি সৌভাগ্যবান হতাম। তাহলে তীব্র আগ্রহে তা দিয়ে চোখে কাজল লাগাতাম।”^{২২}

যে বছর ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ইন্তেকাল করেন, সে বছরই ইমাম শাফেয়ির জন্ম। কেউ কেউ বলেন—যেদিন আবু হানিফা (রহ.) ইন্তেকাল করেন, সেদিনই ইমাম শাফেয়ি (রহ.) জন্মগ্রহণ করেন। এই দ্বিতীয় মতটা শক্তিশালী সনদে রাবি ইবনে সোলায়মান আল মুরাদির কাছ থেকে বর্ণিত হয়েছে।^{২৩}

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) যে বারে মৃত্যুবরণ করেছেন, সে বারেই ইমাম শাফেয়ি (রহ.) জন্মগ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ ইমাম আবু হানিফা সোমবারে মৃত্যুবরণ করলে ইমাম শাফেয়িও সোমবারেই জন্মগ্রহণ করেছেন। বার এক হলেও তারিখ ভিন্ন ভিন্ন।^{২৪}

তিনি বলেন—‘শৈশবে আমি তিরন্দাজি করে বেড়াতাম। এমনকী ডাক্তার আমাকে বলতেন—‘এত বেশি গরমে দাঁড়িয়ে থাকলে তুমি যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হবে।’ আমার নিশানা এতটা অব্যর্থ ছিল যে, দশটার মাঝে নয়টাই লাগত।’^{২৫}

ইলমের প্রতি তীব্র আগ্রহ

তিনি বলেন—‘শৈশবে আমার বাবা মারা যান। ছোটবেলাতেই ইয়াতিম হয়ে যাই। মৃত্যুর সময় বাবা তেমন কিছু রেখে যাননি। লেখাপড়ার খরচ বহন করার সমর্থ্যও আমার মায়ের ছিল না। আমার শিক্ষককে দেওয়ার মতো তাঁর কাছে কোনো কিছু ছিল না। অবশেষে শিক্ষক কোনো কাজে কোথাও গেলে আমি তাঁর হয়ে ছাত্রদের পড়াব—এ শর্তে তিনি আমাকে পড়াতে রাজি হয়েছিলেন।’^{২৬}

অর্থসংকট থাকা সত্ত্বেও ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-এর মধ্যে শৈশব থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করার একটা মনোবল ছিল। ছোটবেলা থেকেই তিনি শেখা ও শেখানোর জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলেন।

তিনি বলেন—‘আমি সাত বছর বয়সে কুরআন এবং ১০ বছর বয়সে “মুয়াত্তা মালিক” মুখস্থ করেছি।’^{২৭}

^{২২} সাইরুন আলাদ দুরাব, পৃ.-৩৬-৩৭

^{২৩} ইমাম বায়হাকি, মানাকিবুশ-শাফেয়ি : খণ্ড-১, পৃ.-৭২; সিয়ারু আলামিন নুবালা : খণ্ড-১০, পৃ.-১২; ইবনে হাজার, তাওয়ালিত তাসিস, পৃ.-৫২-৫৩

^{২৪} ইবনে আবি হাতিম, আদাবুশ শাফেয়ি ওয়া মানাকিবুহি, পৃ.-২১; ইমাম বায়হাকি, মানাকিবুশ-শাফেয়ি : খণ্ড-১, পৃ.-৭১-৭৩; সিয়ারু আলামিন নুবালা : খণ্ড-১০, পৃ.-১২

^{২৫} তারিখে বাগদাদ : খণ্ড-২, পৃ.-৫৮; ইসমাইল বিন মুহাম্মদ ইসপাহানি, সিয়ারুস সালাফিস সালাহিন, পৃ.-১১৭৩; তারিখে দামেশক : খণ্ড-৫১, পৃ.-২৮১; সিয়ারু আলামিন নুবালা : খণ্ড-১০, পৃ.-১১

^{২৬} ইবনে আবি হাতিম, আদাবুশ শাফেয়ি ওয়া মানাকিবুহি, পৃ.-২; হিলয়াতুল আউলিয়া : খণ্ড-৯, পৃ.-৭৩-৭৬; ইমাম বায়হাকি, মানাকিবুশ-শাফেয়ি : খণ্ড-১, পৃ.-১০৫; তারিখে দামেশক : খণ্ড-৫১, পৃ.-২৮২; তারিখুল ইসলাম : খণ্ড-১৪, পৃ.-৩১০

^{২৭} তারিখে বাগদাদ : খণ্ড-২, পৃ.-৬০; মানাজিলুল আইম্মাতিল আরবায়া, পৃ.-২০৫; তারিখে দামেশক : খণ্ড-৫১, পৃ.-২৯৪; তাহজিবুল কামাল : খণ্ড-২৪, পৃ.-৩৬৬; সিয়ারু আলামিন নুবালা : খণ্ড-১০, পৃ.-১১

শৈশবেই তাঁর মূল ভিত্তি স্থাপিত হয়। তারই ওপর ভিত্তি করে তিনি কুরআন-সুন্নাহর ইলম শেখেন।

তারপর তিনি বলেন—‘আমি ২০ বছর আরবের বিভিন্ন গোত্রের মাঝে কাটিয়েছি। তাদের ভাষা ও কবিতা রপ্ত করেছি।’^{২৮}

এ থেকে বোঝা গেল, ফিকাহ বোঝা ও অনুধাবন করার ক্ষেত্রে ভাষার ওপর দখল থাকা খুব জরুরি।

১৮৪ হিজরিতে ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-কে বাগদাদে তলব করা হয়। কারণ, খলিফা হারুনুর রশিদের কাছে একদল আলিপন্থি^{২৯} লোকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়, যারা আব্বাসি খিলাফতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, খলিফাকে অযোগ্য বলে প্রচার করছে। অপপ্রচারকারীদের তালিকায় ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-এর নামও ছিল।

খলিফা হারুনুর রশিদ এ অভিযোগের ভিত্তিতে নয়জনকে হত্যা করেন। নবমজন ছিল মদিনার এক যুবক। সে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে খলিফাকে বলেছিল, ‘আমি যা করেছি, তা আর দ্বিতীয়বার করব না।’ সে মায়ের কাছে পত্র লেখার বিনীত অনুরোধও করেছিল, কিন্তু খলিফা সে সুযোগ না দিয়ে তাকে হত্যা করেন।

^{২৮} তারিখে বাগদাদ : খণ্ড-২, পৃ.-৬১; তারিখে দামেশক : খণ্ড-৫১, পৃ.-২৯৭; তাহজিবুল কামাল : খণ্ড-২৪, পৃ.-৩৬৬; সিয়াকু আলামিন নুবালা : খণ্ড-১০, পৃ.-১২; তারিখুল ইসলাম : খণ্ড-১৪, পৃ.-৩০৮

^{২৯} শিয়াদের এমন একটা দল যারা মনে করে, রাসূল ﷺ-এর ওয়াফাতের পর আলি (রা.)-ই খিলাফতের অধিক যোগ্য। (অনুবাদ)

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)

জন্ম ও জন্মস্থান

আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাম্বল ইবনে হিলাল আশ-শায়বানি আল মারওয়াজি আল বাগদাদি।^{৩০} তাঁর উপনাম আবু আবদুল্লাহ। গর্ভাবস্থায় তাঁর মা তাঁকে নিয়ে মারব অঞ্চল থেকে বাগদাদে চলে যান। সেখানেই তাঁর জন্ম। তাঁর জন্মের ঐতিহাসিক দিনটি ছিল ২০ রবিউল আউয়াল, ১৬৪ হিজরি।

ইলম অর্জনের জন্য ভ্রমণ

ইলম অর্জনের জন্য তিনি দেশ-বিদেশ সফর করেন। পাড়ি দেন দূর-দূরান্তে। কুফা, বসরা, আব্বাদান, ওয়াসেত, মক্কা, মদিনা, ইয়েমেন, শাম, আলজেরিয়াসহ প্রভৃতি অঞ্চল ঘুরে বেড়ান জ্ঞান আহরণের লক্ষ্যে। পায়ে হেঁটে যাত্রা করেন সানা থেকে ইয়েমেনে। ইসলামি রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারা দেওয়ার জন্য এবং জিহাদ করার জন্য তিনি তারতুসে গমন করেন।^{৩১}

যাতায়াত খরচ ও পাথের স্বল্পতার কারণে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) রায় অঞ্চলের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস জারির ইবনে আবদুল হামিদের কাছে যেতে পারেননি। তাঁর কাছে ইলম অর্জনের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

এ ছাড়াও নিশাপুরের প্রসিদ্ধ হাদিসবিশারদ ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়ার কাছে যেতে পারেননি। কারণ, আর্থিক সংগতি ছিল না।^{৩২}

আবার এদিকে তাঁর মা-ও তাঁকে দূরে যেতে দিতেন না। চোখের আড়াল করতে রাজি ছিলেন না। মায়ার টানে মায়ের আঁচলে বেঁধে রাখতেন। মায়ের বাধা উপেক্ষা করে ইলম অর্জনের জন্য দূর দেশে সফর করা তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল।^{৩৩}

ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-কে ইমাম আহমদ (রহ.) কথা দিয়েছিলেন, তিনি তাঁর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হবেন; কিন্তু ভাগ্য সহায় হয়নি। ২০৪ হিজরিতে ইমাম শাফেয়ি (রহ.) মৃত্যুবরণ করেন; ছাত্র-শিক্ষকের আর দেখা হয়নি।

ইবনে আবি হাতেম বলেন—‘হয়তো অর্থ-কড়ি না থাকার দরুন তিনি তাঁর ওয়াদা পূরণ করতে পারেননি।’^{৩৪}

^{৩০} হিলয়াতুল আউলিয়া : খণ্ড-৯, পৃ.-১৬১; তাহজিবুল কামাল : খণ্ড-১, পৃ.-৪৩৭-৪৪২; সিয়াকু আলামিন নুবালা : খণ্ড-১১, পৃ.-১৭৭-১৮৩

^{৩১} প্রাপ্ত

^{৩২} খতিবে বাগদাদি : খণ্ড-২, পৃ.-২৩৩; তবাকাতুল হানাবিলা : খণ্ড-১, পৃ.-৪০৮; জুরকানি, আল আবাতিলু ওয়াল মানাকিরু : খণ্ড-১, পৃ.-২৮৬; ইকমালু তাহজিবিল কামাল : খণ্ড-১২, পৃ.-৩৭৯

^{৩৩} আল মাদখালুল মুফাসসাল : খণ্ড-১, পৃ.-৩৪৪

আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) ছিলেন আরবের প্রসিদ্ধ গোত্র জুহল ইবনে শায়বানের অধিবাসী। তাঁর সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনে মাইন (রহ.) বলেন— ‘আমি আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর চেয়ে ভালো কাউকে দেখিনি। তিনি আমাদের সামনে আরব জাতীয়তা ও নিজের বংশ-মর্যাদা নিয়ে কখনো অহংকার করেননি।’^{৩৫}

মুহাম্মাদ ইবনে ফদল। যার উপাধি হলো আরেম, তিনি বলেন—‘আহমদ ইবনে হাম্বল আমার কাছে টাকা-পয়সা জমা রাখতেন। প্রতিদিন এসে তাঁর প্রয়োজনমত টাকা নিয়ে যেতেন। একদিন আমি তাঁকে বললাম—“হে আবু আবদুল্লাহ! আপনি কি আরব বংশের লোক নন?” তিনি বলেন—“আমরা মিসকিন জাতি। বিত্তহীন গরিব মানুষ।” আমি এ ব্যাপারে তাঁকে অনেকবার জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু তিনি বরাবরই উত্তর এড়িয়ে গেলেন। কিছুতেই নিজ বংশের পরিচয় প্রকাশ করলেন না, কিছু না বলেই চলে গেলেন।’^{৩৬}

আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) এই বিশ্বাস করতেন, মানুষের মূল্য তার কর্মের গুণে হয়, বংশের গুণে নয়। তিনি প্রায়ই অনারব ছাত্রদের ওপর আরব ছাত্রদের বড়াই ও অহংকার লক্ষ্য করতেন। এজন্য তিনি এই সব আলোচনা এড়িয়ে চলতেন।

আমৃত্যু জ্ঞানসাধক

১৭৯ হিজরি। আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর বয়স তখন ১৫ কি ১৬। তিনি ইলমে হাদিস অর্জনের প্রতি মনোনিবেশ করেন। ওই বছরই দুজন জগদ্বিখ্যাত হাদিসবিশারদ দুনিয়া ত্যাগ করেন। একজন মালেক ইবনে আনাস (রহ.), অন্যজন হাম্মাদ ইবনে জায়েদ (রহ.)। তিনি প্রথম হাদিস শোনেন হুসাইম ইবনে বাসির আল ওয়াসিতি (রহ.)-এর কাছে। আর কাজি আবু ইউসুফ (রহ.) থেকে প্রথম হাদিস লেখেন।^{৩৭}

আমৃত্যু তিনি ইলমে হাদিস চর্চা করেছেন। শেষ বয়সেও তাঁর হাতে কাগজ ও দোয়াত কলম দেখা যেত। তিনি সব সময় হাদিস লিখতেন। শেষ বয়সেও তিনি হাদিস সংগ্রহের জন্য অন্যদের সাথে প্রতিযোগিতা করতেন। একবার জনৈক ব্যক্তি তাঁকে প্রশ্ন করল—‘হে আবু আবদুল্লাহ! আপনি অনেক বড়ো আলিম হয়েছেন; এমনকী মুসলমানদের ইমামে পরিণত হয়েছেন। তারপরও কেন আপনি ইলম অর্জনের জন্য এত দৌড়াদৌড়ি করেন?’ উত্তরে তিনি বললেন—‘কবরে যাওয়া পর্যন্ত এই কাগজ-কলমই আমার সঙ্গী।’^{৩৮}

^{৩৫} ইবনে আবি হাতিম, আদাবুশ-শাফেয়ি ওয়া মানাকিবুহি, পৃ.-৬০; হিলয়াতুল আউলিয়া : খণ্ড-৯, পৃ.-১০১; তারিখে দামেশক : খণ্ড-৫১, পৃ.-৩৫৪; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : খণ্ড-১৪, পৃ.-৩৮২-৩৮৩

^{৩৬} তারিখে বাগদাদ : খণ্ড-৫, পৃ.-১৮০; তাহজিবুল কামাল : খণ্ড-১, পৃ.-৪৪৪

^{৩৭} আল মুজালিসা : খণ্ড-৩, পৃ.-৫২৭; ভবাকাতুল হানাবিলা : খণ্ড-২, পৃ.-১৮৩-১৮৪; তারিখে দামেশক : খণ্ড-৫, পৃ.-২৫৮; ইবনুল জাওজি, মানাকিবুল ইমাম আহমদ, পৃ.-৩৬৭

^{৩৮} সালিহ, সিরাতুল ইমাম আহমদ, পৃ.-৩১-৩৩; ইবনুল জাওজি, মানাকিবুল ইমাম আহমদ, পৃ.-২৬; তাহজিবুল কামাল : খণ্ড-১, পৃ.-৪৪৫; সিয়রু আলামিন নুবালা : খণ্ড-১১, পৃ.-৩০৬

^{৩৯} ইবনুল জাওজি, মানাকিবুল ইমাম আহমদ, পৃ.-৩৭